

প্রো-মাস্টার্স
ওয়ার্কশপে গুরুজী

সর্বসুখের
চাবিকাঠি

মনোযোগায়ন

মনোযোগ দিন, আপনি ভালো থাকবেন। শারীরিক মানসিক পেশাগত পারিবারিকসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আসবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আর সার্থকতা। বলা যায়, পরিপূর্ণ মনোযোগ বা মনোযোগায়ন হলো সর্বসুখের চাবিকাঠি। ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, আসলে শরীরের প্রতি আমাদের যথাযথ মনোযোগের অভাবই অধিকাংশ রোগের কারণ। কারণ, মনোযোগের ঘাটতি হয় বলেই সুস্থতার জন্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলো আমরা করি না, অনুসরণ করি না সুস্থ জীবনচারণ। যত্নের অভাবে শরীরের অঙ্গগুলো অকেজো হয়ে পড়ে, কর্মক্ষমতা হারায়। আমরা অসুস্থ হই।

তাই সুস্থ থাকতে চাই মনোযোগায়ন। আর এর মূল কথাই হলো মমতা ও ভালবাসা। এ মমতা দিতে হবে নিজের শরীরের প্রতি, মনের প্রতি। পেশার প্রতি অর্থাৎ নিজের দায়িত্ব ও কাজের প্রতি। এবং সবচেয়ে বেশি দেয়া চাই আমাদের পরিবারের প্রতি।

গুরুজী বলেন, তাই মনোযোগী হোন নিজের শরীর মন পেশা দায়িত্ব পরিবার সবকিছুর প্রতি। মনোযোগায়ন হোক আপনার সর্বসুখের চাবিকাঠি।

কর্মসূচি নভেম্বর ২০১৪

কোয়ান্টাম গ্রাঞ্জুয়েট কোয়ান্টায়ন

৬, ৭ ও ৮ নভেম্বর

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম

৭ ও ৮ নভেম্বর। কেন্দ্র

১৪ ও ১৫ নভেম্বর। উত্তরা

কোয়ান্টাম ধ্যানসাফারি

১৪ ও ১৫ নভেম্বর

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন

১৪ ও ১৫ নভেম্বর। কেন্দ্র

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম

১৪ ও ১৫ নভেম্বর। বনশ্রী

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম

১৪ ও ১৫ নভেম্বর। মিরপুর (পুরুষ)

২৮ ও ২৯ নভেম্বর। প্রশান্তি হল (মহিলা)

প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম : স্টেপ-১

২৮ ও ২৯ নভেম্বর। কেন্দ্র

বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালা

২৮ ও ২৯ নভেম্বর। বনশ্রী

কোয়ান্টাম বুলেটিন



নভেম্বর ২০১৪

আল্লামা ড. এম শমশের আলী

বিক্ষিপ্ত মনকে সুস্থির করে কোয়ান্টাম মেডিটেশন



বিজ্ঞানের নানামুখী আবিষ্কার ও একের পর এক যুগান্তকারী সব উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রা এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ আর আধুনিক হয়ে উঠেছে সত্যি, কিন্তু বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে আমাদের মন। এই বিক্ষিপ্ত মনকে সুস্থির করে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসার যে চিরায়ত পদ্ধতি ও কৌশল, সেটিই শেখায় কোয়ান্টাম মেডিটেশন।

২৬ সেপ্টেম্বর ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে একথা বলেন বরেন্দ্র বিজ্ঞানী, ধর্মতাত্ত্বিক ও টিভি ব্যক্তিত্ব আল্লামা প্রফেসর ড. এম শমশের আলী। দুদশকেরও বেশি সময় ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে যিনি দেখেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা আঙ্গিকে। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং আলোচনা করেছেন নানা বিষয়ে—যেখানে উঠে এসেছে ইসলামের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র এবং মেডিটেশনের চিরায়ত উপযোগিতার বিষয়টি। তার এ বৈচিত্র্যবান আলোচনাগুলোই সংকলিত

হয়েছে ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন বইটিতে। বইটি প্রকাশ করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

অনুষ্ঠানে প্রফেসর শমশের আলী বলেন, মন বিক্ষিপ্ত থাকলে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হয়, তা হলো আমাদের এনার্জি অর্থাৎ মনোদৈহিক শক্তিটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে, মেডিটেশন এ শক্তিটাকে করে তোলে সংহত। তখন একটা সময় আসে যখন সমস্ত শক্তিকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে মানুষের মন ও চেতনা উর্ধ্বমুখী হয়, ধাবিত হয় পরম

শ্রষ্টার দিকে।

সদ্যপ্রকাশিত বইটি সম্বন্ধে তিনি বলেন, আপাতদৃষ্টিতে ইসলাম, বিজ্ঞান ও মেডিটেশন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ হলেও দার্শনিক ভিত্তির দিক থেকে এক অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। এ তিনের মূল লক্ষ্যই হলো শান্তি। আর সারা পৃথিবীর সব মানুষও এটাই চায়। আমি বিশ্বাস করি, কোয়ান্টামের সার্বিক কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও এই শান্তি। মূলত আমার এ উপলব্ধিগুলোই আমি সহজ ভাষায় বলার চেষ্টা করেছি ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন বইটিতে।

মহাজাগতিক সফরে
প্রবীণ সাংবাদিক
ফওজুল করিম
তারা ভাই



বরেন্দ্র সাংবাদিক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রবীণ সদস্য ফওজুল করিম আর নেই। ১৫ অক্টোবর রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ... রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। সংবাদ জগৎ ও শুভানুধ্যায়ী মহলে 'তারা ভাই' নামে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। জনাব ফওজুল করিম ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪র্থ ব্যাচের গ্রাঞ্জুয়েট।

১৯৫৫ সালে তৎকালীন দৈনিক সংবাদে যোগ দেয়ার মধ্য দিয়ে তার সাংবাদিকতা-জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে অধুনালুপ্ত দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান এবং স্বাধীনতার পর দৈনিক বাংলা-র বার্তা সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক পদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

সাংবাদিক ফওজুল করিম তারা ভাই এদেশে দৈনিক পত্রিকার আধুনিক মেক আপ, গোট আপ, ফটো এডিটিং-এর ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ। লে-আউট ডিজাইন বিষয়ে তার ফটো সম্পাদনা গ্রন্থটি সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়।

কর্মজীবনে বেশকিছু গবেষণাধর্মী কাজও করেন তিনি। ইতিহাসের নানা বিষয় বিশেষত ঢাকা-র ওপর তিনি বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কাজ করেন। অনুবাদ করেন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি ও পেশার বিবরণসম্মিলিত জেমস ওয়াইজের নয়টি গ্রন্থ।

আমরা তার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

কোয়ান্টাম মেথড

৩৭৭ তম কোর্স

২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নভেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

ভেন্যু : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

QUANTUM the SCIENCE of LIVING



সাবিয়া সিদ্দিকী

সঙ্গে একাত্মতা যাকে দিয়েছে এক পরিতৃপ্ত মৃত্যু

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন-এর আর্ডেন্টিয়ার সাবিয়া সিদ্দিকী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট ও সংস্কৃতিকর্মী। ১৭ অক্টোবর, গুরুবার বিকেলে সাবিয়া যাচ্ছিলেন কোয়ান্টাম মিডিয়া সেলের সাপ্তাহিক সাদাকায়নে। পথিমধ্যে শিকার হন এক আকস্মিক সড়ক দুর্ঘটনার। এর ঘটনা দেড়েক পরেই পার্থিব সব বন্ধন ছিন্ন করে তিনি পাড়ি জমান অনন্ত জীবনের পথে ...। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

২০১০ সালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩০০ উচ্ছ্বাস ৯ ব্যাচে অংশ নেন সাংবাদিক সাবিয়া সিদ্দিকী। এরও বছরখানেক আগে থেকেই তিনি নিয়মিত আলোকায়ন কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছিলেন। কোর্স সম্পন্ন করার পর কোয়ান্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদপুর শাখা এবং পরবর্তীতে কেন্দ্র ও মিডিয়া সেলে। হয়ে ওঠেন ফাউন্ডেশনের একজন অক্লান্ত স্বেচ্ছাকর্মী।

বছর দুই আগে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিডিয়া সেল। শুরু থেকেই এতে সক্রিয় ও একাত্ম ছিলেন সাবিয়া। এ সেলটির যাত্রা শুরুর সময় থেকে যে-কজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেন, তাদেরই একজন ছিলেন সাবিয়া।

বিভিন্ন পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল কার্যালয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোয়ান্টাম সভা আয়োজন, পরিচিতি সাংবাদিক-সংস্কৃতিকর্মীদের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা, পরবর্তীতে যোগাযোগ করে ফাউন্ডেশনের সব কার্যক্রমের খবর তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া-এসব কাজের সূত্রে সাবিয়া হয়ে উঠেছিলেন ফাউন্ডেশনের একজন স্বতঃস্ফূর্ত কর্মী। সবার কাছেই মানুষ। সেদিন দুর্ঘটনার খবরটি শোনামাত্রই তাই ফাউন্ডেশনের সদস্য আর মিডিয়া সেলের সহকর্মীরা ছুটে গিয়েছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, পরিবারের সদস্যরা পৌঁছানোরও আগেই।

মোহাম্মদপুরস্থ বাসা থেকে বেরিয়ে সেদিন বেলা সোয়া তিনটা নাগাদ সাবিয়া রামপুরা পৌঁছান। বনশ্রীতে ঢোকান মুখে রাস্তা পেরোনোর সময় একটি কাভার্ড ভ্যানের সাথে ধাক্কা লেগে ঘটে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

ঘটনাস্থলে ছিলেন একজন সহৃদয় তরুণ পথচারী শোভন দেবনাথ অরণ্য। তৎক্ষণাৎ সাবিয়াকে তিনি নিয়ে যান স্থানীয় একটি ক্লিনিকে। পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে। ততক্ষণে দুর্ঘটনার খবর জেনেছেন তার সহযোগীরা। সে-সময় সাবিয়ার সাথে ছিলেন প্রো-মাস্টার ও ফেমাস নিউজ ট্রয়েন্টি ফোর ডট কম-এর সাংবাদিক মো. মোস্তাক আহমেদ।

তিনি জানালেন, ‘এত বড় একটা দুর্ঘটনা, কোমর থেকে শুরু করে শরীরের নিম্নাংশে এমন তীব্র জখম, কিন্তু সে তুলনায় সেদিন আশ্চর্যকর শান্ত ছিলেন সাবিয়া। ব্যথার কথা নয়, শুধু দোয়া করতে বলছিলেন। তার মুখে ছিল কেবল একটি কথা-শোকের আলহামদুলিল্লাহ! গুরুজী ও সহকর্মীদের সবার কাছে দোয়া আর মাফ চাইছিলেন। যতক্ষণ বেঁচে ছিলেন, এক হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে শুধু এ কথাগুলোই বলছিলেন বার বার। ভাবলে অবাক হই, অসম্ভব শারীরিক কষ্ট নিয়েও তিনি সে-সময়টাতে পরিপূর্ণ সমর্পিত একজন মানুষের মতোই তার মনোবল ধরে রেখেছিলেন। এমন একটা দুর্ঘটনার পরও যে তিনি এত সময় বেঁচে ছিলেন আর সবার কাছে দোয়া চাইতে পেরেছেন, মনে হয় যেন আল্লাহ ভালবেসে তাকে দিয়েছেন এ সময়টুকু।’

সবমিলিয়ে ফাউন্ডেশনে সাবিয়া ছিলেন খুব অল্প সময়। তুলনায় তার কাজের পরিমাণটি বেশ উল্লেখ করার মতো। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স, কেন্দ্রীয় আলোকায়ন কার্যক্রম, মিডিয়া সেলের সাদাকায়ন সর্বত্রই ছিল তার সদাহাস্যময় উপস্থিতি। আয়োজন করেছিলেন প্রায় গোটা তিরিশেক কোয়ান্টাম সভা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বিটিভি, মাছরাঙা টেলিভিশন, বাংলা ভিশন, বিবিসি বাংলার সাংবাদিক-কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত কোয়ান্টাম সভা যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রক্রিয়া চলছিল এটিএন বাংলা ও চ্যানেল আই-তে সভা আয়োজনেরও।

সাবিয়ার সারাদিনের চিন্তাভাবনা আর ব্যক্তিজীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল তার সঙ্গেচেননা-গুরুজীর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে ফাউন্ডেশনের কাজগুলোকে কীভাবে আরো এগিয়ে নেয়া যায়। যে-কোনো অনুষ্ঠানের আগে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের তালিকা করে সবাইকে আহ্বান জানাতে তার উদ্যম ছিল ক্রান্তিহীন।

লামার কোয়ান্টামম-এ সাংবাদিক-সংস্কৃতিকর্মীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলো সফল করে তোলার ব্যাপারেও তার থাকত সক্রিয় ভূমিকা। কোয়ান্টামম-এ বেড়াতে গিয়ে সবাই হয়তো একসাথে খেতে বসে একটু গল্প করছে, কিন্তু দেখা যেত, সাবিয়া যথারীতি চুপ; কারণ খাওয়ার সময় গুরুজী মৌন থাকতে বলেন। গুরুজীর যে-কোনো নির্দেশনা পালনের প্রতি তার চেষ্টা ছিল এমনই অকৃত্রিম।

অভিনেত্রী মোমেনা চৌধুরী বলেন, ‘ছোট-বড় সবার সাথেই ছিল সাবিয়ার একটা সহজ সম্পর্ক আর হৃদয়তাপূর্ণ যোগাযোগ। অল্পদিনেই সবার কাছ থেকে একটা মমতা আদায় করে নিয়েছিল সে। নিজে ছিল চাপা স্বভাবের, কিন্তু সহকর্মীদের কার কী সমস্যা জেনে নিয়ে হিলিং-এ নাম দিত, অন্যদের কাছেও দোয়া চাইত। আর খুব ঠান্ডা মাথায় গুছিয়ে সব কাজ করার অভ্যেস ছিল ওর। আমার একক অভিনীত মঞ্চনাটক *লালজমিন*-এ নেপথ্য সঙ্গীতায়োজনে কাজ করত সে। এছাড়াও ভালো উচ্চাঙ্গ সংগীত গাইত। পরিকল্পনা করছিল সুর নিয়ে আরো বৈচিত্র্যময় কাজ করার। ফাউন্ডেশনের ভেতরে-বাইরে বিভিন্ন কাজের সূত্রে ওর সাথে আমাদের সম্পর্কটা ছিল এমন-হঠাৎই সবাই যেন একটা শূন্যতার মধ্যে পড়ে গেছি।’

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক ও *রুটস*-এর সম্পাদক মোহাম্মদ মাহমুদজ্জামান বলছিলেন, ‘সাবিয়া ছিলেন ফাউন্ডেশনের একজন দায়িত্ব-সচেতন কর্মী, ছিলেন সময়-সচেতন। আর সঙ্ঘের কাজ নিয়েই ছিল তার দিনমান ব্যস্ততা। কখন কীভাবে কাকে একটু সহযোগিতা করা যায়, সে জন্যেই ছিল তার যত নীরব চেষ্টা। দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগেও ফোনে একজনকে বলছিলেন আসন্ন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিতে আর এক গ্রাজুয়েটের অসুস্থ মায়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছিলেন, কয়েকদিন আগেই যার জন্যে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে রক্তের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।’

সঙ্ঘপ্রেম আর নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততাই সাবিয়াকে দিয়েছে পরিতৃপ্ত মৃত্যু। শেষবার গোসল করানোর সময়ও তাই দেখা গেল-হাতটা রয়েছে সেই কোয়ান্টা ভঙ্গিতেই। আর চেহারায কী অদ্ভুত প্রশান্তি! যেন ঘুমিয়ে আছেন, অপেক্ষা করছেন প্রিয় বন্ধুর সাথে কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাতের।

জীবনে যেমন তিনি একাত্ম ছিলেন সঙ্গে, তেমনি মৃত্যুর সময়টাতেও এমনকি দাফন পর্যন্ত তাকে ঘিরে ছিলেন সংসঙ্ঘের সদস্যরা-তার প্রিয় কোয়ান্টাম পরিবারের সহকর্মী ও সহযাত্রীরা। হৃদয়মথিত কান্না আর নিমগ্ন প্রার্থনায় তারা শেষ বিদায় জানিয়েছেন সাবিয়াকে।

পরম করুণাময় সাবিয়া সিদ্দিকীর সকল কাজকে সৎকর্ম হিসেবে কবুল করুন। পরবর্তী বহু যুগ ধরে ফাউন্ডেশনের সদস্যদের নিরন্তর কর্মপ্রেরণার উৎস ও এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবেন তিনি। ফাউন্ডেশনের সবার আগামী ৪০ দিনের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক পর্যায়ের সকল সৎকর্ম তার অনন্ত শান্তির জন্যে উৎসর্গ করা হয়েছে।

আমরা তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

প্রতিবেদন : ডা. আতাউর রহমান

বিশ্বাসই আমাকে দিয়েছে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি

ছোটবেলা থেকেই ব্যতিক্রম বা স্পেশাল জিনিসগুলো পাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে কাজ করত সবসময়। ঈদের জামা-জুতো থেকে শুরু করে ফুলগাছের টব, এমনকি বিয়ের শাড়িটাও।

বিয়ের বছরখানেক পরেই একটা ফুটফুটে কন্যা সন্তানের মা হই। ১৩ মাস বয়সে আমার মেয়ে বুশরা মেনিনজাইটিস-এ আক্রান্ত হয়। প্রায় দুসপ্তাহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর বোঝা গেল, সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। অথচ ওর দৃষ্টিশক্তি আগে এতটা প্রখর ছিল যে, ছোট পিঁপড়া তুলে নিয়ে সে মুখে পুরে দিত। মনে মনে বলতাম, এত ছোট জিনিসটার দিকেও তোমার চোখ যায়! আমার সেই সুস্থ স্বাভাবিক শিশুটি হয়ে গেল স্পেশাল চাইল্ড, সবার থেকে আলাদা একজন। হঠাৎই অন্যরকম হয়ে গেল আমার চেনা পৃথিবীটাও।

মেয়ের চিকিৎসার জন্যে ছুটতে লাগলাম এদিক-ওদিক। আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে একটাই প্রত্যাশা-বুশরা একদিন আবার দেখতে পাবে। নিয়মিত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে যেতাম ওর চেক-আপের জন্যে। একদিন এক মাকে দেখলাম ১২ বছরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এসেছেন! কী সমস্যা জানতে চাইলে তিনি ঝরঝর করে কঁদে বললেন, ‘ও কিছুই পারে না। চোখে দেখে না, কানে শোনে না, হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, এমনকি ক্ষুধা লাগলে বোঝাতেও পারে না। আমি খাইয়ে দিলে খায়।’ বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হলো, স্রষ্টা আমাকে কত ভালো রেখেছেন! আমার মেয়ে তো এরকমও হতে পারত। তারপর আর বৃথা চেষ্টা করি নি বাচ্চাকে বার বার চিকিৎসা করানোর, সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিলাম সব সীমাবদ্ধতাকে পাশ কাটিয়ে সন্তানকে গড়ে তোলার দিকে।

মিরপুরের একটা রাইন্ড স্কুলে গেলাম বুশরাকে ভর্তি করানোর জন্যে। ওদের ক্লাস টিচারকে দেখে চমকে উঠলাম, পুরো শরীর এসিডে ঝলসে গেছে। তিনিই স্কুলের প্রথম শ্রেণির বাচ্চাদের ব্রেইল পদ্ধতি শেখান। অন্য যে-কোনো স্বাভাবিক বাচ্চা তাকে দেখলে ভয় পায়, কিন্তু রাইন্ড স্কুলের বাচ্চারা তাকে খুবই পছন্দ করে। তিনি এত মমতা দিয়ে পড়ান যে, বাচ্চারা খুব দ্রুত ব্রেইল শিখে যায়। মেয়ের সুবাদে ওই স্কুলে আমি ১০ বছর কাটিয়েছি, আমার মনে হয়েছে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষটা হলেন তিনি। এভাবে আমিও নতুন করে জীবনকে অনুভব করতে শুরু করলাম আমার মেয়েটার সাথে সাথে।

সে পর্যন্ত আমার পথচলায় যত প্রতিকূলতা এসেছে, সর্বাবস্থায় শুধু শুক্রিয়াই আদায় করেছে। সবসময় কেমন এক দৃঢ়তা আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়েছে। স্কুলে অন্য অভিভাবক যারা আসতেন তাদেরকেও আমি সাহস দিতাম, উদ্বুদ্ধ করতাম।

কিন্তু একটা সময় দেখা গেল, আমি নিজেই চারপাশের মানুষ, এমনকি আপনজনদের কাছ থেকেও কটু কথার শিকার হতে হতে খেঁই হারিয়ে ফেলেলাম। এদিকে আমার মেয়েটাও বয়সের সাথে সাথে বুঝতে লাগল, ও আর সবার মতো নয়। ওর অনেক প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি খুঁজে পেতাম না। ভেতরে তাই সারাক্ষণ একটা যুদ্ধ চলছিল। দিনের পর দিন ঘুম হতো না। এমনও হয়েছে, টানা তিন

মাস রাতে ঘুমাই নি। আমার মধ্যে আচরণগত সমস্যা দেখা দিল। কাউকে সহ্য হচ্ছিল না। মানুষ দেখলেই ভয় পেতাম, কুঁকড়ে যেতাম-নিশ্চয়ই এরা আমাকে কিছু একটা বলতে এসেছে, অপমান করতে এসেছে। কাছের মানুষেরা দূরে সরে যেতে লাগল।

একটা সময় নিজেই উপলব্ধি করলাম, আমি যদি অসুস্থ থাকি, আমার পরিবার, তিন ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, বেড়ে ওঠা সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই নিজ উদ্যোগেই গেলাম মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। ডাক্তার ওষুধ দিলেন, ঘুমের সমস্যা কেটে গেল। কিন্তু ওষুধের প্রভাবে সবসময় একটা ঝিমুনি ভাব থাকত। দৈনন্দিন কাজগুলো ভালোভাবে করতে পারতাম না। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিলো-চারপাশের মানুষ আমাকে মানসিক রোগী বলতে লাগল। আমি যেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে বড় অপরাধ করে ফেলেছি! প্রচণ্ড অবসাদ আর বিষণ্ণতায় ভুগতে শুরু করলাম। পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার এবং ওষুধ-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে লাগলাম। সময়গুলো খুব কঠিন ছিল। মনে হতো ধূ ধূ মরুভূমিতে আমি একা।

এর মধ্যে আমার ছোট ভাই কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করল। অনেকটা জোর করেই সে আমাকে পরের ব্যাচে ভর্তি করাল। আমি ৩০০ তম ব্যাচে কোর্স করার পর আমার স্বামী আর বুশরাও কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়।

কোর্সের চার দিন পর আমি অনুভব করলাম, চারপাশের মানুষের প্রতি আমার যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল, সেটা আর নেই। সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারছি। মনে হচ্ছিল, আমার ভেতর থেকে সব ধুমুমেছে আমি এক নতুন মানুষ হয়ে উঠেছি।

ডাক্তারকে বললাম, আমি মেডিটেশন করছি, আর কি ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন আছে? তিনি উল্টো নিরাশ করে বললেন, মেডিটেশন সুস্থ মানুষদের জন্যে, আপনার জন্যে না। কিন্তু তার কথায় আমি একটুও দমে যাই নি। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা শুরু করলাম এবং নিজেই চেষ্টা করে ক্রমান্বয়ে দু-একটা করে ওষুধ কমাতে লাগলাম। একসময় বেরিয়ে এলাম ১০ বছরের ওষুধ-নির্ভরতা থেকে।

তবে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হলাম নিয়মিত সাদাকায়ন ও আলোকায়নে গিয়ে। বিশ্বাস করতে লাগলাম, সবাই নেতিবাচক নয়, কিছু ভালো মানুষও আছেন। ওষুধ ছাড়ার মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে ফাউন্ডেশনে আমার এই লেগে থাকাটা।

নিজের সুস্থতার ক্ষেত্রে যেমন সজ্ঞকে পেয়েছি প্রতি মুহূর্তে, তেমনি আমার মেয়ের পড়ালেখার সাফল্যের ক্ষেত্রেও সজ্ঞই আমাকে শক্তি জুগিয়েছে সবসময়। স্রষ্টার অপর করুণায় আমার মেয়েটা স্কুলে বরাবরই প্রথম হয়েছে। এসএসসি পাশের পর আরেকটা সাফল্যের অধ্যায় হলো ওর কলেজে ভর্তি।

দেশের স্বনামধন্য দুটো কলেজে মেধা তালিকায় সে সুযোগ পায়। কিন্তু একটি কলেজে বলে দিলো,



মায়ের সাথে নাহিয়ান বুশরা

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্যে কোনো সুযোগ তাদের ওখানে নেই। কিন্তু ভিকারুননিসা নূন কলেজে শিক্ষকদের আন্তরিকতা আমাকে বিস্মিত করল। তারা বললেন, ও যদি বোর্ড থেকে পাশ করতে পারে তাহলে আমাদের কলেজে কেন পড়তে পারবে না?

সেদিন চোখভরা জল নিয়ে ভাবছিলাম, আমার মনছবিটা স্রষ্টা এভাবে সত্যি করে দিলেন! মেয়েকে প্রতিদিন সেগুনবাগিচা থেকে মিরপুর স্কুলে আনা-নেয়ার পথে ভাবতাম, বাসার কাছে ভিকারুননিসার মতো এত ভালো স্কুল, আমার মেয়ে যদি আর সবার মতো হতো তাহলে নিশ্চয়ই ও এখানে পড়ত। এই ভাবনা কখন যে মনছবিতে রূপ নিয়েছে বুঝি নি।

কলেজ পাশের পর দানা বাঁধল নতুন স্বপ্ন-আমার মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। আমি ফরমও তুললাম শুধুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। কেমন একটা দৃঢ়তা কাজ করছিল যে, আমার মেয়ে পড়লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়বে, নইলে পড়বে না। বুশরার বান্ধবীরা, চারপাশের মানুষেরা আমার একথা শুনে হাসত। কিন্তু আমি বিশ্বাসে অটল ছিলাম যে, স্রষ্টা চাইলে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

সত্যিই তিনি আমাদের প্রচেষ্টা আর প্রার্থনা কবুল করলেন। বুশরা এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছে। ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি, পরীক্ষা, রেজাল্ট-এ পুরো সময়টাতে কোয়ান্টাম পরিবারের সবাই আমাদের জন্যে দোয়া করেছে, উৎসাহ জুগিয়েছে। সেইসাথে নিয়মিত হিলিং-এ নাম দিয়েছি। মাটির ব্যাংকে দান করেছি।

শুধু পড়ালেখাতেই নয়, খেলাধুলাসহ সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোতেও ওর আগ্রহের কমতি নেই। ১০ বছর বয়স থেকে বুশরা ছায়ানটে গান শেখে। শিশুদের চার বছরের কোর্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এখন পড়ছে নজরুল সংগীতে চতুর্থ বর্ষে।

ওর সাফল্যের পথ এতটা সহজ ছিল না। বহু প্রতিকূলতা এসেছে। কিন্তু কোয়ান্টামে আসার পর থেকে আমি কখনোই আর নেতিবাচক হই নি, বিশ্বাস হারাই নি। সবসময় মনে হয়েছে, গুরুজীর দোয়া আছে, সজ্ঞের দোয়া আছে। ভালো কিছু হবেই।

যে-সময় ব্যর্থতায় তলিয়ে যাচ্ছিলাম, চারপাশের নেতিবাচক মানুষদের তখন আনন্দিত হতে দেখেছি। ভীষণ অন্ধকারে একটু আলো খুঁজেছি, কাউকে পাশে পাই নি। সেই আলোর সন্ধান পেয়েছি কোয়ান্টামে। পেয়েছি সুস্থতা, প্রশান্তি আর অগণিত কল্যাণকামী মানুষের একটা বড় পরিবার। আমি শিখেছি-চারপাশের মানুষের করুণা নিয়ে নয়, সত্যিকারভাবে বাঁচতে হলে নিজের সুস্থতার দায়িত্ব নিজেই নিতে হবে আর একাত্ম থাকতে হবে সৎসজ্ঞে।

নাজমা নিহার চৈতী, গৃহিণী
৩০০ ব্যাচের গ্রাডুয়েট

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি



আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীতে একটা আয়াত পড়ে জানলাম, মানুষ নিজেই নিজের ওপর জুলুম করে। এ বিষয়টি আমাকে খুব নাড়া দিয়েছে। উপলব্ধি করলাম, সত্যিই জীবনের দুঃখকষ্টের মূলে থাকে মানুষের নিজেরই ভুল আচরণ, ভুল সিদ্ধান্ত।

আবু তাহের • ব্যবসায়ী



এখন কোয়ান্টামের কথা অন্যদের বলা সহজ হয়েছে। নিজের জীবনে নতুন এক জ্ঞানের অধ্যয়ন শুরু হয়েছে এই মর্মবাণী পড়ে।

ডা. মোহাম্মদ মাইনউদ্দীন



মর্মবাণীর ভূমিকা পড়েই মনটা শান্তিতে ভরে যায়। এটা যতবারই পড়ি, কোরআন পাঠের উদ্দেশ্য খুঁজে পাই। কোরআন আসলে কেন পড়ব, বাংলা মর্মবাণী পড়ার আগে আমার কাছে এ উদ্দেশ্যটাই এতদিন পরিষ্কার ছিল না।

ফাহিমদা ইয়াসমিন • শিক্ষার্থী



অন্যান্য অনুবাদে সূরা হিজর এর ২৩ নং আয়াতে 'আমি ফলদায়ক বায়ু প্রেরণ করি' কথাটা কখনোই বুঝতে পারি নি। মর্মবাণীতে আছে, 'আমি বায়ু দ্বারা পরাগায়ন ঘটাই'। অর্থটা সহজেই বুঝতে পারলাম আর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম।

জান্নাতুল ফেরদৌস • চাকরিজীবী



জীবনে অনেক মূল্যবান উপহার অনেককে দিয়েছি। কিন্তু মর্মবাণী উপহার দিয়ে যে সমৃদ্ধি পেয়েছি তা সত্যি অতুলনীয়।

রেহানা আক্তার পারুল • গৃহিণী



আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীর ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্যে খুবই সমরোপযোগী হয়েছে।

হাজেরা খানম • শিক্ষক



নামাজে যে সূরাগুলো পড়ি, মর্মবাণীতে সেগুলো বাংলায় পড়ার পর আমার নামাজে মনোযোগ আরো বেড়ে গেছে।

সালেহা হক • গৃহিণী



আল কোরআন পূর্ণাঙ্গ মর্মবাণীর প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা, 'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি কখনো সমান হতে পারে?' এই বাক্যটা পড়লেই আমার মধ্যে জানার আকুতি আরো বেড়ে যায়।

মেহনাজ আহমেদ • শিক্ষার্থী, ইউন মহিলা কলেজ



আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীর প্রচ্ছদটাই কাছে টানে। দেখে মনে হয় যেন প্রাণ খুলে হাসছে।

এডভোকেট তাসলিমা চৌধুরী • বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট



মর্মবাণীর লেখাগুলোই যেন জীবনের সমস্ত সমস্যার জট খুলে দিচ্ছে।

শিরিন সুলতানা • ব্যবসায়ী

আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পাঠ



কোনো কারণে মন খারাপ হলে মর্মবাণী পড়ি; মন ভালো হয়ে যায় এবং নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। এর আগে বিভিন্ন বিষয়ে অন্যদের জিজ্ঞাসা করতাম যে, এ সম্পর্কে কোরআনে কী বলা আছে। এখন নিজেই উত্তর খুঁজে নিতে পারছি।

তানিয়া মাহবুব • শিক্ষার্থী



মর্মবাণী পড়া শুরু করামাত্রই বিষণ্ণতা, টেনশন, হতাশা, দুঃখ সব উধাও হয়ে যায়। সৃষ্টির আদি রহস্য থেকে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট ধারণা কোরআন ছাড়া আর কোনো গ্রন্থে পড়ে আমি পাই নি।

সুভাশীষ দাশ • শিক্ষার্থী



আল্লাহ তায়ালা মেয়েদের কতটা উচ্চাসন দিয়েছেন, তা কোরআনের বাংলা মর্মবাণী পড়লে যে-কেউ সহজে উপলব্ধি করতে পারবে।

নাসরীন আরা সুরাত আমিন • চাকরিজীবী



অর্থ বুঝতাম না বলে কোরআন পড়ার আত্মহারা হয়ে ফেলেছিলাম। আরবি উচ্চারণ সঠিকভাবে না করলে গুনাহ হবে, এজন্যে অনেক বছর কোরআন স্পর্শও করি নি। এখন আমি মর্মবাণী প্রতিদিন পড়ছি।

সাহিদা খানম • গৃহিণী



অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে আমার পরিবারে এখন প্রশান্তি অনেক বেশি। মর্মবাণী পাঠ ও বিতরণের কল্যাণেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

মো. কামরুজ্জামান • শিক্ষক, শফিউদ্দীন সরকার একাডেমি এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর



মর্মবাণী চর্চা করার মধ্য দিয়ে প্রভুর কৃপাকে অনুভব করতে পারছি। দৈনন্দিন জীবনের ভুলগুলো সম্পর্কেও সচেতন হতে পারছি।

রুমুর দেব • শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট



এতদিন মনে করতাম কোরআন হচ্ছে আলেম-ওলামাদের বোঝার বিষয়, আমি শুধু তেলাওয়াত করতে পারলেই হবে। কিন্তু কোরআন যে শুধু তেলাওয়াত করার বিষয় নয়, কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং মানাও যে ফরজ তা বুঝতে পেরেছি বাংলা মর্মবাণী পড়ে।

আশফাকুর রহমান আদনান • সংবাদকর্মী, এসএ. টিভি



মর্মবাণী পাঠ করার আগে আমি কোনোদিন মনের গভীর থেকে শুকরিয়া আদায় করতে পারি নি। এখন পারছি। এ আমার পরম পাওয়া।

মুন্সাসির ইবনে ইলিয়াছ • চাকরিজীবী



মর্মবাণী পাঠ করতে গিয়ে দেখলাম, ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে সুন্দর করে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ সমাজে এটা নিয়ে কত ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে, যারা অন্য ধর্মের তাদের সাথে কথা বলব না!

সামিনা ইয়াসমিন চুমকি • গৃহিণী



জীবনের অর্থ খোঁজার জন্যে আমাদের এত ছোট্টাছুটি, অথচ তা এই কোরআনের মর্মবাণীতেই খুঁজে পাচ্ছি।

মো. হামিদুর রহমান • উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক



জীবনে ভালো কাজের ফল যে ভালো, বাংলা মর্মবাণী পাঠ করে সেটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

টুস্পা রায় • শিক্ষার্থী



এ এক অন্যরকম অনুভূতি। যখনই কোরআনের বাংলা মর্মবাণী পড়ছি, মনে হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আমার সাথে কথা বলছেন এবং আমি তার নির্দেশনাগুলো সুন্দরভাবে বুঝে নিচ্ছি।

তাহমিনা জুবাইর • গৃহিণী



অনেক সময় মর্মবাণী ১৫-২০ মিনিট পড়ব বলে শুরু করি, কিন্তু পড়তে পড়তে দেখা যায় অনেক বেশি সময় পার হয়ে গেছে। এখন আর কোরআনকে দুর্বোধ ও অচেনা মনে হয় না। বাংলা মর্মবাণী পবিত্র কোরআনকে আমাদের হৃদয়ের কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

মো. জগলুল হোসেন • চাকরিজীবী



শুধু পুণ্যের আশায় কতবার কোরআন খতম করেছি! কিন্তু একটি শব্দেরও অর্থ বুঝি নি। শুধু মন্ত্রের মতো পড়ে গেছি, মুখস্থ করেছি। এই কোরআনের পাতায় পাতায় যে কত হাসি-কান্নার ঘটনা, কত আনন্দের সংবাদ আর কত ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা, এর কিছুই জানা ছিল না।

অলি আহমদ মোল্লা পল্লব • আই টি প্রফেশনাল



কাউকে কোয়ান্টামের কথা, সংপথের কথা যখন বলতাম, তারা গ্রহণ না করলে খুব কষ্ট পেতাম। এখন আর পাই না। কারণ মর্মবাণী পড়ে জানলাম, মানুষের দায়িত্ব শুধু সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়া। একজনের দায়িত্ব অন্যের ওপর বর্তাবে না।

ওয়াসিমা আক্তার • শিক্ষক



কোরআনের অন্য বাংলা অনুবাদে পড়েছি, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।' আর মর্মবাণীতে বলা হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও।' ভাষার এত চমৎকার প্রয়োগ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

এম এম হান্নান • ব্যবসায়ী



আল কোরআন মর্মবাণী যত পড়ছি, মনে হচ্ছে নিজের প্রতি, জীবনযাপনের প্রতি আমার দায়িত্ব আরো বেড়ে যাচ্ছে। না জানার কারণে যা ছিল গতানুগতিক, এখন তা ভাবনা-চিন্তার বিষয়। প্রতিটি কাজে এখন আলাদা আনন্দ পাই।

নুরুল ইসলাম • চাকরিজীবী, বাংলাদেশ রেলওয়ে



সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ বলেছেন, মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে অতিমাত্রায় তাড়াহুড়া করে। মর্মবাণী পড়ে উপলব্ধি করলাম বিষয়টি প্রত্যেকের জন্যে কত সত্য!

জেসমিন • গৃহিণী



মর্মবাণী চর্চা শুরু করার পর থেকে গীবতের ব্যাপারে আরো সচেতন হতে পারছি। নিজেকে এখন ঠান্ডা মাথায় সামলাতে পারছি। মানুষের সব কথার সমুচিত জবাব দেয়ার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। মানুষকে সহযোগিতা করার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোসাম্মদ সেলিনা আক্তার • শিক্ষক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ



আগে কোরআন বের করতাম ভয়ে ভয়ে, আর পড়তে কষ্ট হতো বলে অনেক দিন পর পর বের করতাম। কিন্তু এখন একদম ভয় করে না। কেউ ধর্মের কথা বললে আত্মবিশ্বাস কাজ করে যে, আমিও জানি।

সাজিয়া আফরোজ • গৃহিণী



ভাবতাম আল্লাহ ভীষণ কঠোর, সবসময় দণ্ড দেয়ার জন্যে অজুহাত খুঁজছেন। কিন্তু মর্মবাণী পাঠ করে অনুভব করলাম আল্লাহ কত মেহেরবান! আরো জানলাম, নামাজ-যাকাতের কথা আল্লাহ যত বলেছেন তার চেয়েও বেশি বলেছেন সৎকর্ম, দান আর অন্যের কল্যাণ করার কথা।

ড. শাহীদা রহমান • শিক্ষক



কোরআনের মর্মবাণী চর্চা করে শোকর ও সবরের পথে থাকতে পারছি।

ডা. জুবাইদা পারভীন • সহকারী রেজিস্টার, শিশু নিউরোলজি বিভাগ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল



অন্যান্য অনুবাদ পড়ে মনে করতাম কোরআন শুধু একটি ধর্মের মানুষদের জন্যে। কিন্তু মর্মবাণীতে মুসলিম শব্দের আসল অর্থ উপলব্ধি করেছি।

ওয়াহিদ ইমরান • শিক্ষার্থী



কোরআনের মর্মবাণী চর্চার মাধ্যমে আমার পরিবারে সচ্ছলতা এসেছে। এটা আমার জন্যে নিরাময় হিসেবে কাজ করছে।

সুভাশীষ বসু • শিক্ষার্থী, বরিশাল বিএম কলেজ



আমি যখন অস্থিরতায় ভুগি, মর্মবাণী পড়তে শুরু করি। কিছুক্ষণ পরেই দেখি মনটা শান্ত হয়ে গেছে।

তাহমিনা আজম • ব্যবসায়ী



মর্মবাণী পড়ার ফলে আগের চেয়ে আমার টেনশন অনেক কমে গেছে।

শামীমা আক্তার • প্রভাষক, পরভী ডিগ্রি মাদ্রাসা, কুমিল্লা



‘হে করুণাময়! তুমি আমাকে যেখানেই নাও সত্য ও কল্যাণের সাথে নাও। আর যেখান থেকেই ফিরিয়ে নাও, সত্য ও কল্যাণের সাথে ফিরিয়ে নাও। তোমার কুদরতি শক্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।’ সূরা বনি ইসরাইলে এই দোয়াটি চর্চা করে অনেক বড় বিপদ থেকে আমি বেঁচে গেছি।

তাওহীদুল আলম • ব্যবসায়ী



বাংলা মর্মবাণীতে সূরা বনি ইসরাইল যত বার পড়েছি, নিজের জন্যে প্রার্থনা করেছি যেন মা-বাবার সাথে কখনো দুর্ব্যবহার না করি।

তানিয়া আফরোজ • শিক্ষার্থী



একই ভুলের পুনরাবৃত্তি মানুষকে সত্যপথ থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং প্রতিটি মানুষকেই স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতে হবে—এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করলাম বাংলা মর্মবাণী পাঠ করে।

সুদীপ্ত কর্মকার • প্রকৌশলী



আমি আমার কলেজের শিক্ষকদের কোরআনের মর্মবাণী পুস্তিকা উপহার দিয়েছি। সবাই বলেছেন, তারা এত সুন্দর উপহার কখনো পান নি।

আজমির আহমেদ • শিক্ষার্থী



কোরআনের মর্মবাণী চর্চা শুরু করার পর থেকে টিভি, ফেসবুক, ইন্টারনেট-এর আসক্তি কমেছে। এসব ছাড়াই চলতে পারছি।

মো. মোস্তাফিজুর রহমান • শিক্ষক



মর্মবাণীতে সূরা বালাদ-এ বর্ণিত দাসমুক্তি বিষয়টি পড়ে এই প্রথম উপলব্ধি করলাম—মানসিক দুশ্চিন্তার দাসত্বও মানুষকে দাস বানিয়ে রেখেছে।

মো. মোস্তাক আহমেদ • সাংবাদিক



প্রতিদিন কোরআনের বাংলা মর্মবাণী পড়ার ফলে আমার শরীর-মন প্রফুল্ল থাকে। কাজে মন বসে এবং অনেক ভারী কাজও সহজ মনে হয়।

রৌশন আরা • গৃহিণী



নারী-পুরুষ সম্পর্কিত আয়াত নিয়ে মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। মর্মবাণীতে সূরা নিসার আয়াতগুলো পড়ে অনুভব করলাম, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী বলেই সবকিছুর এত চমৎকার সিস্টেম করে দিয়েছেন।

ফারজানা আক্তার • চাকরিজীবী



কোরআনের ভাষা এত সহজ তা আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পড়ার আগে জানতাম না। যত পড়ি, ততই পড়তে ইচ্ছা হয়।

তাহমিনা বেগম চৌধুরী • সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইউএন মহিলা কলেজ



আমার মা যখন কোরআনের সুন্দর সুন্দর আয়াত পড়ে আমাকে শোনায়, আমি অভিভূত হই আর অনুপ্রাণিত হই নিয়মিত কোরআন পড়ার জন্যে।

মো. সামিন ইয়াসার খ্রিয় • শিক্ষার্থী, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল



যতই পড়ি, মর্মবাণীর প্রতিটি বাক্য যেন চিন্তার দরজাগুলো খুলে দেয়।

মো. জাকির হোসেন • ডেপুটি সেক্রেটারি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



এ সমাজে আমাদের শৈশব-কৈশোরে কোরআন ইসলাম সৃষ্টিকর্তার ভীতিপ্রদ উপস্থাপন ধর্মের সাথে আমাদের একটা দূরত্ব তৈরি করে দেয়। কোরআনের মর্মবাণী এ দূরত্ব ঘোচাবে বলে আমার বিশ্বাস।

ড. শায়লা নাসরিন • সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা



কোরআনের জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ অনুভব করছি মর্মবাণী পড়ে।

মো. জাহাঙ্গীর আলম কামাল • ইঞ্জিবাইক চালক



কখনো চিন্তা করি নি যে, কোরআনের মর্মবাণী বিতরণের এত বড় সুযোগ জীবনে পাব। বিতরণের ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া পেয়েছি কিন্তু কোনো কিছুতেই বিতরণের আকাঙ্ক্ষা কমে নি একটুও। এটাই মনে হয় কোরআনের শক্তি।

ডা. মো. হামিদ ইবনে আব্দুল্লাহ



নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কোরআনের মর্মবাণী যে নিয়মিত পড়ে, তার পক্ষে বেশিক্ষণ নেতিবাচক থাকা, হতাশ থাকা সম্ভব নয়।

লায়লা পারভীন হিমেল • চাকরিজীবী



আমি বিশ্বাস করি, আমরা যদি কোরআনের মর্মবাণী নিজে পড়ি এবং অন্যকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করি, তাহলে আমাদের সমাজ ও দেশ কোরআনের আলোয় আলোকিত হবে।

কৃষ্ণা রাণী মণ্ডল • শিক্ষক



চারপাশের মানুষের নেতিবাচক কথায় আর প্রভাবিত হচ্ছি না। এই মর্মবাণী পড়ার আগে জানতাম—ভুলের কোনো মাফ নেই, আল্লাহ হিসাবের ক্ষেত্রে খুব কঠিন। কিন্তু কেউ কখনো বলে নি যে, স্রষ্টা এত মহান! এত উদার!

সারা জেরিন লিসা • শিক্ষার্থী



নিয়মিত মর্মবাণী পাঠ আমার বিশ্বাসের স্তরকে আরো উন্নত করতে সাহায্য করছে।

শফিকুর রহমান শাফী • শিক্ষার্থী, এমআইএসটি



‘দুর্ভোগ সেই নামাজীদের জন্যে যারা সচেতনভাবেই নামাজে অমনোযোগী’—এই আয়াতটি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। এখন আকাশ ও পৃথিবীর যেকোনো তাকাই, স্রষ্টার করুণা দেখতে পাই।

আনজুমান আরা • গৃহিণী



আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আন্দাজ-অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, এ বিষয়ে জানার পর আমি সচেতন হতে চেষ্টা করছি।

মাকসুদা আহমেদ • গৃহিণী

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন » ? » উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আল্লাহ আমাকে পছন্দ করেন না। তাই আমার জীবনে সমস্যার শেষ নেই।

উত্তর : আপনি জীবনের কতটুকুই-বা দেখেছেন! আল্লাহ যাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন, আল্লাহর হাবিব হযরত মুহাম্মদ (স), তাঁর জীবনের সমস্যা দেখুন-বাবার চেহারা তিনি দেখেন নি কোনোদিন। অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করার আগে বাবা মারা গেছেন। ছয় বছর বয়সে মা-ও নেই। তারপর তাঁর সারা জীবনজুড়ে কত সংগ্রাম আর একের পর এক পরীক্ষা! আর আপনি বলছেন যে, আল্লাহ আপনাকে পছন্দ করেন না!

আপনার জীবনে যদি সমস্যার শেষ না থাকে, তাহলে বুঝবেন-আল্লাহ আপনাকে খুব ভালবাসেন। আল্লাহর বিশেষ মনোযোগ আপনার প্রতি রয়েছে। আপনি সাধারণের কাতারে নেই, বিশেষ কাতারে আছেন। অতএব আপনার অর্জনটাও বিশেষ হতে পারে, যদি আপনি সবার করেন।

আসলে সমস্যা মানে কী? কোয়ান্টামে আমরা বলি, সমস্যাকে উপভোগ করুন। সমস্যা এলে মনে করবেন যে, পিঠা এসেছে; কিংবা জন্মদিনের কেক। তারপর আরামের সাথে কেক কাটুন আর টুকরো টুকরো করে খেতে থাকুন। প্রত্যেকটা সমস্যা নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত হবে। আমরা সমস্যাকে বলি সম্ভাবনা। এবং যত সমস্যা এসেছে, আমরা সেটিকে নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করেছি। অতএব সবসময় সমস্যাকে স্বাগত জানান।

প্রশ্ন : প্রচলিত আছে, সৎপথে বড়লোক বা বিত্তবান হওয়া যায় না। কেবল কালোবাজারি বা দুর্নীতিবাজরাই অর্থশালী হয়। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

উত্তর : পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করা যায় না, এর চেয়ে দ্রুত ধারণা আর কিছু নেই। আপনি যদি মানুষকে প্রতারিত না করে সেবা দেন, অবশ্যই আপনি বিত্তবান হতে পারেন। প্রয়োজনীয় একটা পণ্য উৎপাদন করে যে আপনাকে সেবা দিচ্ছে, সে কি বিত্তবান হচ্ছে না? যারা বিত্তবান হচ্ছে, তারা সবাই কোনো না কোনোভাবে সেবা দিয়েই হচ্ছে। আর যারা হাইজ্যাক করে, কালোবাজারি করে, ব্যাংক লোপাট করে অর্থশালী হয়, তাদের এই ধনসম্পত্তিটা কিছুদিন থাকে। সেটা খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং সেটা কখনো সম্পদে রূপান্তরিত হয় না। আপনার টাকাটা তখনই সম্পদে রূপান্তরিত হবে, যখন আপনি সেবা দেবেন। সম্পদ সবসময়ই হচ্ছে সেবার বাই-প্রোডাক্ট। এটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়।

যেমন, একজন হাইজ্যাকার বা ব্যাংক-লুটেরা, অনেক টাকা লুট করে নিয়ে সে কখনো প্রাচুর্যবান হতে পারে না। লটারিতে টাকা জিতেও তা হওয়া সম্ভব নয়। অনেক আগে, প্রায় ১৭/১৮ বছর আগে বিবিসি-র একটা অনুষ্ঠানে দেখছিলাম-১০ জন কিংবা ১২ জনকে আনা হয়েছে, যারা জ্যাকপট জিতে লটারিতে এক মিলিয়ন পাউন্ড পেয়েছে। তাদের প্রশ্ন করা হলো, এই এক মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে আপনারা কী করলেন? আগে কেমন ছিলেন, আর এখন কী অবস্থা? তাদের সবাই-ই বলল, আগে যে অবস্থায় ছিলাম, এখনো সে অবস্থাতেই আছি। মাঝখানে

কিছুদিন বড় বড় হোটেলে থেকেছি, ভালো খাওয়াদাওয়া করেছি, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি, এ পর্যন্তই। আগেও গরিব ছিলাম, ট্রামে চড়তাম, এখনো তা-ই আছি, ট্রামে-বাসেই চলি। অর্থাৎ যা নিজের কষ্টে অর্জিত বা শ্রম দ্বারা অর্জিত নয়, সেটা কখনো স্থায়ী হয় না।

আবার বড় বড় কোম্পানিগুলো দেখুন, যারা শিল্পপণ্য উৎপাদনের মধ্য দিয়ে মানুষকে সেবা দিচ্ছে, মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করে দিচ্ছে, তেমনি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হলো ভারতের টাটা। আপনি সকালবেলা উঠে টাটা-র তৈরি পাত্রে খাবার রান্না করবেন, টাটা-র আটা দিয়ে রুটি বানাবেন, টাটা-র লবণ দিয়ে খাবেন, টাটার গাড়িতে করে বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাবেন, অফিসে যাবেন, ঘুমাবেন টাটা-র তৈরি খাটে। অর্থাৎ জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রেই তারা আপনাকে সেবা দিচ্ছে। স্বাভাবতই তারা মুনাফাও করছে। আর অন্যদিকে একজন কিছুই দেবে না, জালিয়াতি করে টাকা কামাই করবে, সেই টাকা থাকবে? অসম্ভব। তাই সবসময় মনে রাখবেন-যা শ্রমে অর্জিত নয়, যা সেবা দিয়ে অর্জিত নয়, সেটা খুবই ক্ষণস্থায়ী।

প্রশ্ন : এ বছর পারিবারিকভাবে আমার এনগেজমেন্ট হয়। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, বিয়ে এখনো হয় নি। সমস্যা হলো, ছেলেটি আমার সাথে কথায় কথায় খুব খারাপ ব্যবহার করে। আমাকে খুব এড়িয়ে চলে। তার এসব ব্যবহারে আমি খুব কষ্ট পাই। আমি বলেছি, যদি সে মনে করে যে, আমাকে পছন্দ করে ভুল করেছে তাহলে আমি সরে যাব। একথা শুনে সে তার ভুলের জন্যে ক্ষমা চায়, ওয়াদা করে-আর এমন করবে না এবং বলে যে, সে আমাকে খুব ভালবাসে, আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। কিন্তু সে পাঁচ/ছয় দিন পরেই সব ভুলে যায়। এই পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। আমাদের দুজনের পরিবারও এসব নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে।

উত্তর : সমস্যাটা কিন্তু তার মধ্যে নয়, সমস্যাটা আপনার মধ্যে। এই যে সে বলে, আপনাকে খুব ভালবাসে, আপনাকে ছাড়া থাকতে পারবে না-পৃথিবীতে এর চেয়ে বাক্যে কথার আর কিছু নেই। আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ অথবা কোনো স্ত্রী সহমরণে যায় নি যে, আমার স্বামী বা আমার স্ত্রী মারা গেছে, আমিও তার সাথে মরে যাই। আগের যে-সব সহমরণের কাহিনী আমরা শুনি, সেগুলোতে জোর করে মেয়েদেরকে চিতায় তোলা হয়েছে। কেউ ইচ্ছা করে যায় নি। এবং সহমরণে কোনো পুরুষ কখনো যায় নি। আবার এ নিয়ে গল্পও আছে। এক ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছে, সে খুব কান্নাকাটি করছে। সবাই সাবুনা দিচ্ছে। একজন বলল যে, এত চিন্তার কী আছে! ৪০ দিন যাক, তারপরে তোমাকে আবার বিয়ে করিয়ে দেবো। তখন এ স্বামী বলছে, এই ৪০ দিন আমি কীভাবে চলব? এজন্যে কান্না দিচ্ছি।

এখানে আসল কথা হলো, আপনাদের দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা। বিয়ের আগেই যদি এ অবস্থা হয়, এটা নিয়ে আপনাকে যথেষ্ট চিন্তা করতে হবে। কিন্তু কী করবেন, না করবেন সেটা পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন। পরিবারের সাথে কথা বলুন। ঝুলে থাকবেন না। দোদুল্যমানতায়

ভুগবেন না। আর তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না-এসব বাক্যে কথা। যে মেয়ে বা ছেলে এসব বিশ্বাস করে, তাকে কিছু বলার নেই। এরা সব ভাটুরাল ওয়ার্ল্ডে থাকে, বায়বীয় জগতে।

বিয়ে আসলে একটা প্রয়োজন। অথচ মিডিয়ায় কল্যাণে বিয়ে সম্পর্কে একটা অযৌক্তিক ধারণা আমরা পোষণ করি, যেন পৃথিবীতে এর আগে কেউ এরকম ঘটনা ঘটায় নি। আপনার আগে কেউ বিয়ে করে নি। আপনার পরেও কেউ করবে না। কেবল আপনিই বিয়ে করতে যাচ্ছেন। অথচ বিয়ে হচ্ছে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। একজন মানুষের জীবনে যে-রকম চাকরি, ব্যবসা, পড়ালেখা, মৃত্যু-একেকটা স্বাভাবিক ঘটনা, তেমনি বিয়েটাও একটা স্বাভাবিক ঘটনা। এটা একটা প্রয়োজন।

সেই প্রয়োজন শারীরিক হতে পারে, মানসিক হতে পারে, আবেগিক, সামাজিক, পারিবারিক নানান প্রয়োজনে হতে পারে। সেই প্রয়োজনটা পূরণ হচ্ছে কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজন পূরণ হলে বিয়ে টিকবে আর যদি পূরণ না হয় তাহলে 'তোমাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না', এর চেয়ে অর্থহীন কথা আর কিছু নেই। আর প্রয়োজন পূরণ হলে 'তোমার জন্যে আমার মরার কোনো প্রয়োজন হইবে না'। আমি বাঁচিয়া থাকিব। এটা হচ্ছে সহজ হিসাব।

কথাগুলো খুব রুচ মনে হতে পারে কিন্তু এটাই বাস্তবতা। এখনকার ছেলেমেয়েরা এই বিভ্রান্তিতে ভোগে যে, বিয়ের পরে-অতঃপর তারা সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করিতে লাগিল। না, তা নয়, কারণ বিয়ের পরে তো আসল জীবন শুরু হয়। অতএব সেভাবে বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন। অহেতুক বিভ্রান্তিতে ভুগবেন না।

প্রশ্ন : আমি ড্রাগ এডিকশন হতে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারছি না। কিছুদিন ভালো থাকি কিন্তু আবার শারীরিক ও মানসিক সমস্যা তৈরি হয়। গত তিন মাস যাবৎ ড্রাগ থেকে দূরে আছি। কিন্তু এখনো সমস্যা হচ্ছে, কী করণীয়?

উত্তর : আসলে ড্রাগ এবং ফ্রেডশিপ-এ দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ ড্রাগ কেউ একা নেয় না। যে বন্ধুদের সাথে আপনি ড্রাগ নেন, সেই বন্ধুদের সাথে দেখা হলে বা যোগাযোগ হলেই আপনার ড্রাগ নেয়ার ইচ্ছাটা জেগে উঠবে। আপনি ড্রাগের প্রতি আবার আসক্ত হয়ে যাবেন। অতএব যারা ড্রাগ থেকে মুক্তি পেতে চান, তাদের জন্যে ফরজ হচ্ছে, যে বন্ধুদের সাথে আপনার ড্রাগের সম্পর্ক তাদের সাথে যোগাযোগকে হারাম মনে করবেন। তাদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিন। তাদের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকুন। তাহলেই আপনি ড্রাগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। যন্ত্রণা কম হবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

মনোযোগ কাজের একঘেষেয়ি দূর করে। আমি মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি কাজ করব। ফলে কাজ হবে আনন্দের উৎস।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

বনশ্রীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করসেবা



১১ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বনশ্রী কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করসেবার। এতে অংশ নেন কোয়ান্টিয়ার ও আর্ডেন্টিয়াররা। বনশ্রী এ রকে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ করসেবায় ঝোপঝাড় পরিষ্কার এবং বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা ময়লা আবর্জনা সরানো ও নির্দিষ্ট স্থানে অপসারণের কাজ করেন তারা।

অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো করেন অংশগ্রহণকারী ৪০ জন কোয়ান্টিয়ার ও আর্ডেন্টিয়ার। সৃষ্টির সেবার প্রয়াসে এখন থেকে প্রতি মাসের ১ম শনিবার বনশ্রীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করসেবা আয়োজনের আশ্রয় প্রকাশ করেন তারা।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোয়ান্টাম সভা

১৯ অক্টোবর নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় ধানমন্ডি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দুটি পৃথক কোয়ান্টাম সভা। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ জন শিক্ষার্থী ও ২১ জন শিক্ষক। আলোচনা করেন অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল। এ সভাটি আয়োজন করেন আর্ডেন্টিয়ার ও নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মেহেদী শাহনেওয়াজ জলিল।

২০ ও ২১ অক্টোবর যাত্রাবাড়ি কার্যালয়ের উদ্যোগে ডেমরার কাজলাতে ডা. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে অনুষ্ঠিত হয় মোট ৩৩টি কোয়ান্টাম সভা। সভাগুলোতে 'শিক্ষার্থী জীবনে সাফল্যের জন্যে কোয়ান্টাম মেথড' বিষয়ে আলোচনা করেন আর্ডেন্টিয়ার আফরীন জাহান রোজী, দিলারা আক্তার, আতিকুল হক চৌধুরী, অজয় পাল, এস. এ. এম ইয়াহিয়া সোহেল, মাসুম মিঞা, শাহ মো. ফজলে রাব্বি, শাহরিয়ার হোসেন এবং অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল ও ইঞ্জিনিয়ার নিজাম হাসান সাদী। কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ফরিদ উদ্দীন ও শাহ আলী সজলের সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজিত এ সভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১৮০০ জন।

২৭ অক্টোবর লালমাটিয়া মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম সভায় অংশ নেন প্রায় পাঁচ শ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। এতে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার মারুফ ইবনে মাহবুব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ মো. রফিকুল ইসলাম। সভাটি আয়োজন করে মগবাজার শাখা এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদপুর ও যাত্রাবাড়ি কার্যালয়ের আর্ডেন্টিয়ারবন্দ।

মতিঝিল শাখার উদ্যোগে বিশেষ এসোসিয়েট ওয়ার্কশপ

১৮ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মতিঝিল শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ এসোসিয়েট ওয়ার্কশপ। তিন ঘণ্টাব্যাপী এ ওয়ার্কশপে আলোচনার বিষয় ছিল-কোয়ান্টাম পরিবার সুখী পরিবার, কেন টেনশন এবং টেনশন মুক্তির পথ। পারিবারিক প্রশান্তি ও সাফল্যের জন্যে কোয়ান্টাম মেথড-এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এ ওয়ার্কশপে।

ওয়ার্কশপে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মতিঝিল শাখার মোমেন্টিয়ার অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ও অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল। ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করেন শাখার দায়িত্বশীল খন্দকার সজিবুল ইসলাম সজিব। এতে উপস্থিত ছিলেন মোট ২৩১ জন এসোসিয়েট।

খুলনায় মাটির ব্যাংক রং করসেবা



২৪ ও ২৫ অক্টোবর খুলনা শাখায় অনুষ্ঠিত হয় মাটির ব্যাংক রং করসেবা। নিজের কল্যাণ ও বধিগতের সেবার প্রতীক কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকগুলো সবার ব্যবহার-উপযোগী করার পাশাপাশি সমাজবদ্ধ কাজের অনুরণন সঞ্চারণ করাই ছিল এ করসেবার মূল লক্ষ্য।

প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ করসেবায় অংশ নেন বিভিন্ন সেল, গ্রুপ-সেলের আর্ডেন্টিয়ার ও কোয়ান্টিয়াররা। চমৎকার উৎসবমুখর পরিবেশে ও কোয়ান্টিয়ারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দুদিনে মোট ৩৬ জন কোয়ান্টিয়ার সম্মিলিতভাবে রং করেন ২২ শতাধিক ব্যাংক।

চট্টগ্রামে ওয়ার্কশপ, ঈদ পুনর্মিলনী ও পরিচ্ছন্নতা করসেবা



১৭ অক্টোবর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় এটিকেট, ম্যানার ও টাইম ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক একটি বিশেষ ওয়ার্কশপ। বিএমএ হলে অনুষ্ঠিত প্রায় ছয় ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ২৬০ জন গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার।

সময় ব্যবস্থাপনা, কর্মস্থলে সঠিক আচরণ, কর্মস্থলে উপযোগী পরিবেশ, ফাইল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ভিডিও প্রদর্শনসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার ও রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ) কাজী শামীম।

১৮ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে নগরীর মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে একইসাথে ছিল ঈদ-উল-আযহা, শারদীয়া দুর্গা পূজা ও প্রবারণা পূর্ণিমা

পুনর্মিলনী উৎসব। এ অনুষ্ঠানে মূল আলোচক ছিলেন আর্ডেন্টিয়ার ডা. মেহেদী আল মাসুদ। আলোচনার বিষয় ছিল 'পারিবারিক অস্থিরতায় আমাদের করণীয়'। এ অনুষ্ঠানে পারিবারিক আলোচনা এবং মেডিটেশনের পাশাপাশি ছিল কোয়ান্টিয়ার ও আর্ডেন্টিয়ারদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক আয়োজন।

এ দুটি প্রোগ্রাম সঞ্চালনা করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানিয়ার কো-অর্ডিনেশন এস. এম. সাজ্জাদ হোসেন এবং পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সহযোগী সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন আর্ডেন্টিয়ার আবুত্বিশ্বী দিলরুবা খানম।

চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে ২৪ অক্টোবর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা করসেবা পরিচালিত হয়। ৭৭ জন কোয়ান্টিয়ার ও আর্ডেন্টিয়ার মোট সাতটি গ্রুপে ভাগ হয়ে এ পরিচ্ছন্নতা করসেবা পরিচালনা করেন।

এতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৪টি ওয়ার্ডের শতাধিক টয়লেট ও গোসলখানা পরিষ্কার করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ডে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শেষে অংশগ্রহণকারীরা সবাই মিলে এক মিনিট প্রার্থনা করেন।

ফাউন্ডেশনের এ ধরনের সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারার আনন্দ অনুভূতি অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তী বৈঠকে ব্যক্ত করেন। হাসপাতালের সেবা গ্রহণকারীরাও ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগের প্রশংসা করে দোয়া করেন। বৈঠকের সমাপনী বক্তব্যে বাবু তিন কড়ি চক্রবর্তী অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আশ্রয়ীরা যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/তি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে গুরুজীর আহ্বান

সালাম বিনিময় হোক পারিবারিক শান্তির উৎস

সামাজিক পরিমণ্ডলে, কর্মক্ষেত্রে, রাস্তাঘাটে কারো সাথে দেখা হলে আমরা সালাম দেই। সাধারণভাবে কুশল বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ হয় সালাম বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। ‘আসসালামু আলাইকুম’ কথাটির অর্থ হলো, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অথচ পারস্পরিক সুখশান্তি কামনার এ শুভচর্চা সবচেয়ে কম হয় আমাদের পরিবারগুলোতে। কিন্তু একটি সুখী মমতাময় পারিবারিক আবহ সৃষ্টির জন্যে এক অনবদ্য উপায় হতে পারে এই কল্যাণ কামনা। পরিবারের সদস্যদের সাথে সালাম বিনিময় হতে পারে একটি সুন্দর পারিবারিক সংস্কৃতি। ১৫ অক্টোবর প্রো-মাস্টারদের মাসিক কার্যক্রম সজ্জা জালালিতে এ কথাগুলো বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, আবহমান কাল ধরে প্রাচ্যের, বিশেষত আমাদের একটি বড় গর্বের বিষয় আমাদের পরিবার। পাশ্চাত্যের স্থল ভোগবাদী সংস্কৃতির আধাসনে পড়ে তাদের পরিবারগুলো বহুকাল ধরেই বিপর্যস্ত। যার ফলাফল ওদের আজকের ক্রমবর্ধমান সামাজিক জটিলতা, হিংস্র অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তি আর মানসিক ও স্নায়বিক অসুস্থতা। পাশ্চাত্যের পরিবারগুলো আজ সত্যিকার অর্থেই ভাঙনের মুখে।

সে বিবেচনায় আমরা এখনো ভাগ্যবান। যদিও অবিদ্যাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি, ভায়োলেন্সপূর্ণ টিভি সিরিয়াল ও অসুস্থ বিনোদন আর আর্থসামাজিক নানা কারণে আমাদের পরিবারগুলো বর্তমানে একটি সংকটকাল অতিক্রম করছে। বাড়ছে স্বামী-স্ত্রী কিংবা অভিভাবক-

সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি আর অকারণ দূরত্ব। আর এ অসহনীয় দূরত্ব দূর করতে চাই সমমর্মিতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ-যা সৃষ্টি হতে পারে, বহমান ও অটুট থাকতে পারে প্রতিদিন পারস্পরিক কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়ে। আমরা যার সূচনা ঘটাতে পারি পরিবারে সালাম আদানপ্রদানের অভ্যাসটি গড়ে তোলার মাধ্যমে।

সন্তানের সাথে মা-বাবা-অভিভাবকদের সম্পর্ক কেমন হবে, সে প্রসঙ্গে গুরুজী বলেন, কিছু বিষয় আছে যা মোকাবেলা করতে কুশলী হতে হবে। বর্তমানে পরিবারগুলোতে একটি সাধারণ সমস্যা হলো, সন্তান মা-বাবার কথা শোনে না। অনেকে এক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করে বসেন। আসলে শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করতে যাওয়াটাই ভুল। কারণ শক্তি প্রয়োগ করে এখনকার ছেলেমেয়েদের ভুল চিন্তা বা কর্মকাণ্ডকে থামানো যায় না। এর মোকাবেলা করতে হবে বুদ্ধি প্রয়োগ করে।

প্রথমত, সন্তানের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। সন্তানকে কথা শোনাতে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান কেন আপনার কথা শুনতে চায় না, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের কথা শোনে? কারণ সে মনে করছে, বন্ধুরা তার ব্যাপারে বেশি মনোযোগী। অথচ বাস্তবে তার ব্যাপারে মা-বাবার মনোযোগ যে অনেক বেশি, এটা সে বোঝে না। বুঝতে চায় না।

দ্বিতীয়ত, আরেকটা কারণে সন্তান কথা শুনতে চায় না, সেটা হলো বাবা-মা-অভিভাবকদের কথাগুলো সে একইভাবে বহুবার শুনেছে। তাই তাকে

একটু অন্যভাবে বোঝাতে হবে। পাশে বসিয়ে মমতা দিয়ে বোঝান। সন্তান তখনই আপনার কথায় প্রভাবিত হবে, যখন সে আপনাকে ভালবাসতে শুরু করবে। সব কাপড় কিন্তু সজোরে মাটিতে আছাড় দিয়ে ধোলাই করা যায় না, কিছু কাপড় খুব আস্তে আস্তে ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। সন্তানও তেমনি। এজন্যে আগে তার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন।

আর এ সুসম্পর্ক গড়ে তোলার একটি শক্ত ভিত্তি হতে পারে পরিবারে সালাম বিনিময়। শুধু সন্তানের সাথেই নয়, পরিবারের ছোট-বড় সবার সাথে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে, ঘর থেকে বেরোনোর আগে, ঘরে ফিরে আসে নিজে সালাম দিন। বড়দের দেখাদেখি ধীরে ধীরে পরিবারের ছোটরাও এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

গুরুজী বলেন, ১০ বছর আগে, ২০০৪ সালে আমরা ‘শৈশবের আলহামদুলিল্লাহ! বেশ ভালো আছি’ বলা শুরু করেছিলাম। তারপর থেকে পরম করণাময়ের রহমতে আমরা সত্যিই অনেক ভালো আছি। এই ২০১৪ সালে এসে আমরা সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক শুভকামনার অভ্যাসটির চর্চা শুরু করতে চাই।

কারণ, সব ভালো কথারই শুভ প্রভাব আছে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিদিন হাসিমুখে এই নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়ে শুধু কোয়ান্টামের পরিবারগুলোই নয়, চারপাশের অগণিত পরিবার হবে শান্তি ও সুখের নীড়।

অনুষ্ঠানে মা-জী মাদাম নাহার আল বোখারী বলেন, উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ার, নিত্যনতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার-এর সবই জীবনে প্রয়োজন; কিন্তু আমরা যেন পশ্চিমা স্রোতে গা ভাসিয়ে না দেই। আমাদের শান্তির উৎস আমাদের পরিবার। আর পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে যেন কোনোভাবে গুরুত্বহীন মনে না করি। পরিবারে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, কিন্তু পারস্পরিক বোঝাপড়াটা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে কোনো চ্যালেঞ্জ বা কোনো প্রতিকূলতাই শেষপর্যন্ত কোনো সমস্যা নয়।

১০৭ ও ১০৮ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে বক্তারা নিয়মিত দান মানুষকে বড় করে



গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শামসুন নাহার

২৪ সেপ্টেম্বর ও ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হলো শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের ১০৭ ও ১০৮ তম আয়োজন। ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন দূশতাপ্রিয় আজীবন রক্তদাতাকে অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হয়।

১০৭ তম আয়োজনের প্রধান অতিথি ছিলেন



লালমাটিয়া মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো. রফিকুল ইসলাম

লালমাটিয়া মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘মানুষের জীবন বাঁচানো সকল ধর্মই অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হয়। আর রক্তদাতারা নিজ দেহের রক্ত স্বেচ্ছায় দান করে সে কাজটিই করে যাচ্ছেন।’

১০৮ তম আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শামসুন নাহার। রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘রক্তের বিকল্প শুধু রক্তই হতে পারে এবং মানুষের প্রয়োজনে যারা এগিয়ে আসে, তারাই সত্যিকারের মানুষ। নিজে নিয়মিত রক্তদানের পাশাপাশি চারপাশের মানুষদেরও উদ্বুদ্ধ করতে হবে, রক্তদান সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। আসলে নিয়মিত দানই মানুষকে বড় করে তোলে। যিনি দাতা, স্রষ্টার কাছে তার মর্যাদা অনেক বেশি। আমার বিশ্বাস, যে দেশের তরুণেরা রক্তদানের মতো মহান কাজের সাথে জড়িত থাকতে পারে, সে দেশ একদিন বড় হবেই। আর সেবার এই আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে রেখেছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, যা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।’

অনুষ্ঠান দুটিতে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের কো-অর্ডিনেটর মিসেস মাসুদা আক্তার আবেদীন ও ডা. মনিরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে প্রত্যেক রক্তদাতাকে একটি সার্টিফিকেট, বিশেষ আইডি কার্ড ও বিশেষ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : নভেম্বর ২০১৪ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহুতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
কর্তৃক ৩১/শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ॥ E-mail : bulletin@quantummethord.org.bd